দ্বিশতবার্ষিক স্মরণ

যুদ্ধশেষের আলোকবর্তিকা: ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

কিংকরী দাস

প্রাচীন দেশ ইতালির প্রাসাদ ও গির্জায় ঘেরা শহর ফ্লোরেন্স। ইতিহাস-আশ্রিত এই শহরে যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রজ্ঞা সঞ্চিত হয়েছে পাথরের মধ্যে। সেই ঘনীভূত মগ্নচৈতন্যকে জাগ্রত করতেই বোধ হয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম ফ্লোরেন্সে। পাথরে বদ্ধ সেই প্রাণশক্তি তাঁর জীবনে ঝরনাধারার মতো বয়ে গেছে। আজও আমরা তার জল পান করে পরিতৃপ্ত হই, উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি। সেবার মাধ্যমে বিশ্বের মানুষকে তিনি সুস্থ জীবন তথা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে চেয়েছিলেন, যা অবলম্বন করে মানুষ দুরন্ত গতিতে বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

> শুধুই 'দীপহস্তা দেবী' নন, তিনি আরও অনেক কিছু। বিশ্বের নিপীড়িত শ্রেণির জন্য বহুমুখী তাঁর কর্মপন্থা। ভারতের কৃষি, সেচ, স্বাস্থ্য, শিক্ষার জন্য চল্লিশ বছর তাঁর সংগ্রাম। পৃথিবীতে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশ্বমানব হয়েছেন, ফ্লোরেন্স তাঁদেরই একজন। নীরবে পেরিয়ে গেল তাঁর জন্মের দুশোতম বছর।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ। যুদ্ধক্ষেত্র ক্রিমিয়া। ব্রিটেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এবং তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল। এতে প্রচুর ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হল। সমরসচিব সিডনি হার্বার্ট সৈন্যদের সেবা ও শুশ্রূষার দায়িত্ব দিলেন ফ্লোরেন্সকে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে তুরস্কের কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের স্কুটারি ছিল আহত সৈন্যদের সামরিক হাসপাতাল। ৫ নভেম্বর ফ্লোরেন্স ফিমেল নার্সিং এস্ট্যাবলিশমেন্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে স্কুটারির হাসপাতালে পৌঁছলেন, সঙ্গে আটত্রিশ জন নার্স। সামরিক দপ্তরের প্রতিনিধি হলেও শুধু থাকার স্থানটুকুই তাঁরা পেলেন। হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীরা সহযোগিতার হাত তো বাড়ালেনই না, উপরন্তু বিরোধিতাই করলেন। চারদিন শুধু বসে থাকতে হল তাঁদের। রাতে ডাক্তারেরা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, ফ্লোরেন্স তখন তুর্কি প্রদীপ হাতে টহল দিতে বেরোতেন। চতুর্দিক অপরিচ্ছন্ন, তারই মধ্যে চার মাইল লম্বা বিছানার সারি। ফুটখানেক তফাতে আহতরা শুয়ে। অপারেশন টেবিল, চিকিৎসা, ওষুধপত্রের

জোগান, আসবাবপত্র কিছুই ছিল না। এতসব 'না'কে কীভাবে 'হ্যাঁ' করতে হয় সেই কৌশল জানা ছিল ফ্লোরেন্সের। ক্রিমিয়ার যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েই আবির্ভূত হলেন 'Lady with the Lamp'।

ব্রিটেনের এক অভিজাত ও প্রভাবশালী ভূস্বামী পরিবারের দম্পতি উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেল ও ফ্রান্সিস স্মিথ। ইতিহাস-ভক্ত বিদ্যোৎসাহী উইলিয়াম সস্ত্রীক গ্রিস ও ইতালি ভ্রমণে বেরোন। সেখানেই ফ্লোরেন্স শহরে ভিলা কলম্বিয়ায় ১৮২০ সালের ১২ মে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্ম। উইলিয়াম দুই মেয়েকেই ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান ও ফরাসি ভাষা শিখিয়েছিলেন। গণিত ও ইতিহাসে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। বাবার প্রভাবে ফ্লোরেন্সের পরিচয় হয় চিরায়ত সাহিত্য, ইউক্লিডের জ্যামিতি, গ্রিক দর্শন, রাজনীতির সঙ্গে। বাবাই তাঁকে শেখান কীভাবে সঠিক চিন্তা করতে হয় এবং নির্দিষ্ট কাজে মনঃসংযোগ করতে হয়। মাত্র সতেরো বছর বয়সেই তিনি প্রচুর বই পড়ে ফেলেন। পরবর্তী কালে গণিতের তত্ত্বগবেষক জেমস্ জোসেফ সিলভেস্টারের কাছে উচ্চস্তরের গণিতচর্চা করেন। তাঁর সেরা ছাত্রী ছিলেন ফ্লোরেন্স। দাদু উইলিয়াম স্মিথ ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচিত সাংসদ। যাঁরা দাসপ্রথা তুলে দেওয়ার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

একদিন হ্যাম্পশায়ারে দেশের বাড়ি এম্বলে পার্কের বাগানে ফ্লো একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য অন্তরে প্রভু যিশুর আহ্বান শুনতে পেলেন তিনি। ফ্লো ডায়েরিতে লিখেছেন, ''তিনি বললেন তাঁর সেবা করতে।" সেদিন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। তিনি বুঝলেন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। প্রথমেই হাসপাতালে অসুস্থদের সেবা করার কথা তাঁর মনে এল। সেইসময় হাসপাতালগুলি ছিল রীতিমতো আতঙ্কের স্থান—যেমন অপরিষ্কার তেমনই অস্বাস্থ্যকর। নার্সরা কেউ সেবার প্রতিমূর্তি ছিলেন না। তাঁরা অপরিচ্ছন্ন, অমনোযোগী ও মাতাল বলে পরিচিত ছিলেন। ভদ্রপরিবারের কোনও মেয়ের এ-পেশা গ্রহণ ছিল কল্পনাতীত।

ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডের অভিজাত মহিলারা শ্রমবিমুখ ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। স্ত্রী ও জননীর ভূমিকা পালনকেই তাদের একমাত্র কর্তব্য মনে করা হত। ফ্লোরেন্সের মা ও দিদি পার্থেনোপও তাঁর কাছ থেকে তেমনটাই চাইতেন। ফ্লোরেন্সই প্রথম এই সামাজিক কাঠামোটি ভাঙেন। তিনি দেখলেন ধনী মহিলারা কীভাবে নিজেদের জীবনের অপচয় করে চলেছে। হতাশায় ডুবে যেতে যেতে ফ্লো ডায়েরির পাতায় লিখলেন, "I see the number of my kind who have gone mad for want of something to do."

আমেরিকাবাসী মানবহিতৈষী স্যামুয়েল হাওকে একদিন বাড়িতে পেয়ে ফ্লোরেন্স প্রশ্ন করলেন—তাঁর মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের পক্ষে কি সেবিকা হওয়া একেবারেই অসম্ভব? হাও তাঁকে উৎসাহ দেন। ফ্লোরেন্স জানতেন কাজ করতে হলে প্রশিক্ষণ দরকার। ১৮৪৬-এ তাঁর এক বন্ধু খবর পাঠালেন যে, জার্মানির কাইজারভের্থ-এ কয়েকজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী একটি সংস্থা চালান যেখানে সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ মহিলারা রোগীদের সেবা করেন। বাড়ির তীব্র বিরোধিতায় ফ্লোরেন্স গোপনে হাসপাতাল ও স্যানিটেশন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। বিবাহের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন বিবাহ তাঁর কাজের প্রতিবন্ধক হবে। সেসময় বিভিন্ন কারণে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রোমে গেলে সিডনি হার্বার্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন তিনি।

পিতার সমর্থনে তিনমাসের জন্য ফ্লোরেন্স কাইজারভের্থে কাজ করতে গেলেন (১৯৫১)। লন্ডনের 'ইনস্টিটিউট ফর দ্য কেয়ার অফ সিক জেন্টলম্যান'-এর সুপারিনটেন্ডেন্ট হলেন ১৯৫৩ সালে। মাত্র দশ দিনে প্রতিষ্ঠানটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করলেন তিনি। বিরোধিতার মুখোমুখি হলেন, অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্তও নিতে হল। তবুও কাজ করতে পেরে তিনি খুশি। বাবা তাঁর জন্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করলেন যাতে তাঁকে পরমুখাপেক্ষী না হতে হয়, যদিও মা এতে অখুশিই হলেন। ফ্লো এইসময় ইংল্যান্ডের হাসপাতাল ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে একটি সুখপাঠ্য গবেষণাপত্র রচনা করলেন।

স্কুটারির ব্যারাক হাসপাতালে গিয়ে (১৯৫৪) খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছিল ফ্লোরেন্সকে। তাঁদের পৌঁছনোর পরের দিন হাসপাতালে এল বালাক্লাভার যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে আহত একদল মানুষ। ফ্লোরেন্স আর তাঁর নার্সরা সঙ্গে যা কাপড় ছিল তা দিয়েই বানালেন ব্যান্ডেজ, বালিশ, জামা, এছাড়া কাঠের পা-দানি। এরপর রান্নাঘরে কিছুটা অধিকার তাঁরা কায়েম করলেন। ফ্লো সঙ্গে করে এনেছিলেন মদ্য, গোমাংসের নির্যাস আর ছোট ছোট উনুন। চিকিৎসকদের কিছুটা ছাড়পত্র পেয়ে ধীরে ধীরে সেই খাদ্যসামগ্রীই ক্ষুধার্ত মানুষগুলির মুখে তুলে দিতে লাগলেন তাঁরা। তিনদিন পর রুগ্ন ও আহতদের ঢেউ আছড়ে পড়ল স্কুটারিতে। চিকিৎসক ও কর্মীরা বাধ্য হয়ে তাঁদের সাহায্য নিল।

বালাক্লাভার যুদ্ধে ব্রিটিশদের হার ও ইঙ্কেরমানের যুদ্ধে জয় হল। এদিকে আহতদের সংখ্যা বেড়েই চলল। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হাসপাতাল প্রশাসন ভেঙে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে ফ্লোরেন্সদের উপস্থিতি স্বীকার না করে তাদের উপায় রইল না। এছাড়া তিনি ব্রিটেন থেকে বেসরকারি কিছু অর্থসাহায্যও পাচ্ছিলেন। তখন একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা ছিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনাবার। তিনি রোগীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর একটি দোকান খুললেন। সেখানে ওষুধ, ব্যান্ডেজ, বিছানার চাদর, জামাকাপড় সবই পাওয়া যেত। রোগীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চিকিৎসকেরা তাঁর দোকান থেকেই কিনতেন কারণ সরকারি লালফাঁস অতিক্রম করে হাসপাতালের গুদাম থেকে জিনিস পেতে দেরি হত। বিষয়টি সিডনি হার্বার্টকে লিখে ফ্লোরেন্স স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনেন এবং নিজস্ব দোকানটি বন্ধ করে দেন।

ডিসেম্বরের গোড়ায় লর্ড র‍্যাগল্যান জানালেন, তিনি আরও পাঁচশো আহত মানুষকে পাঠাবেন। তখন হাসপাতাল ভর্তি। তার ওপর হাসপাতালের একাংশ আগুন লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফ্লোরেন্স সেটিকে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলার আর্জি জানালেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ও তুর্কি শ্রমিকেরা

এ-কাজে তাঁকে বাধা দিলেন। ফ্লোরেন্স তখন তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় আর প্রাপ্ত অনুদানের সাহায্যে এই ব্যয়ভার বহন করলেন।

পরিস্থিতি কঠিনতর হল ১৮৫৫-র জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতে। কিন্তু ফ্লোরেন্স ঠান্ডামাথায় সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে হাসপাতাল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করলেন। এদিকে উন্নতি সত্ত্বেও মৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়তে লাগল। চারজন শল্য চিকিৎসক, তিনজন নার্স আর কয়েকশো সৈনিক মারা গেলেন তিন সপ্তাহে। সংবাদপত্রে এই খবর পড়ে দেশবাসী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। চাপে পড়ে সরকার ফেব্রুয়ারিতে স্যানিটারি কমিশন পাঠালেন। তারা দেখল হাসপাতালের ময়লা-নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুব খারাপ। চারদিকে আবর্জনা আর স্যাঁৎসেঁতে অবস্থা। জলও দূষিত। প্রথম দু-সপ্তাহে পাঁচশো ছাপ্পান্নটি হাতগাড়ি-ভর্তি ময়লা ও দুটি ঘোড়া সমেত ছাব্বিশটি মৃত জন্তুকে কবর দেওয়া হল। এভাবে অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটল।

ফ্লোরেন্স অসীম ধৈর্য, দয়া আর প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে অসুস্থ সৈনিকদের পাশে থেকে তাঁদের মনে আশার সঞ্চার করতেন। তাঁদের প্রতি ফ্লোরেন্সের শ্রদ্ধা বদলে দিয়েছিল সাধারণ ফৌজিদের প্রতি ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। সৈন্যরাও গভীর শ্রদ্ধা করতেন ফ্লোরেন্সকে। এক সৈনিক বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন : ''আগে মনে হত নরকে পড়ে আছি। এখন মনে হয় যেন প্রশান্তিতে ভরা একটি চার্চে শুয়ে আছি।'' সকলকে বাঁচাতে না পারার যন্ত্রণা ফ্লোরেন্সকে কাঁদাত—''হায় আমার দুর্ভাগা সন্তানেরা! আমি অত্যন্ত হীন মাতার মতো তোমাদের ক্রিমিয়ার কবরে ফেলে রেখে নিজে ঘরে ফিরলাম!''

স্কুটারির পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে মে মাসের রোদ-জল মাথায় নিয়েই ফ্লোরেন্স ক্রিমিয়ার চিকিৎসাকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখতে লাগলেন। ফলে সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হলেন তিনি। দু-সপ্তাহ আর ওঠার ক্ষমতা রইল না তাঁর।

সেবাস্টোপোলের পতন হল ৮ সেপ্টেম্বর। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশবাহিনীর জয়ের সূচনা হল। এইসময় থেকে যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত ফ্লোরেন্স পালা করে স্কুটারি ও ক্রিমিয়া যাতায়াত করতেন। এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও বা মালবাহী ঘোড়ার গাড়িতে মালের বস্তার ওপর বসে তিনি সারাদিন ধরে যাতায়াত করতেন সুদীর্ঘ পথ। কখনও তুষারবৃষ্টিতে পথে আটকে থেকেছেন। কখনও বা বহুক্ষণ হেঁটে মাঝরাতে পৌঁছেছেন নিজের কুটিরে।

চিফ অফ মেডিক্যাল স্টাফ ড. হল ডিসেম্বর মাসে রিপোর্ট পেশ করলেন। এতে ফ্লোরেন্সের বিরুদ্ধে আনুগত্যহীনতা এবং তাঁর নার্সদের বিরুদ্ধে অসততা, অপচয়, অবাধ্যতা, অদক্ষতা ও চরিত্রহীনতার অভিযোগ আনা হল। এসবই ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আঘাত পেলেন ফ্লোরেন্স। সরকারও ফ্লোরেন্সের নামে কালিমা লেপনের চেষ্টা চালাল। ১৮৫৬-র গোড়ার দিকে 'কমিশন ইনটু দ্য সাপ্লাই অফ দ্য ব্রিটিশ আর্মি ইন দ্য ক্রিমিয়া' তার রিপোর্ট পেশ করল পার্লামেন্টে। ফ্লোরেন্সের দেওয়া যাবতীয় তথ্য সত্য বলে স্বীকার করল এই রিপোর্ট।

১৮৫৬-র ২৯ মার্চ যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হল ফ্রান্সে। উভয় দেশের মধ্যে শান্তিচুক্তি হল। জুলাইতে শেষ রোগী ছাড়া পাওয়ার পর ফ্লোরেন্স ইংল্যান্ডে ফিরলেন। তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, ''কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যুদ্ধের বিভীষিকা কেমন হতে পারে। ক্ষত, রক্ত, প্রচুর বা অল্প জ্বর, দীর্ঘস্থায়ী তীব্র পেটের অসুখ বা দুর্ভিক্ষই মাত্র নয় সে-বিভীষিকা। সে হল হীনতরদের উন্মত্ত নিষ্ঠুরতা, নীতিভ্রষ্টতা, বিশৃঙ্খলা এবং উচ্চতরদের ঈর্ষা, নীচতা, অযত্ন আর স্বার্থপর নিষ্ঠুরতা।''

ফ্লোরেন্সের অতুলনীয় কাজের জন্য লন্ডনের

বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকা তাঁকে 'The Lady with the Lamp' আখ্যা দিয়ে লেখে, ''She is a 'ministering angel' without any exaggeration in these hospitals, and as her slender form glides quietly along each corridor, every poor fellow's face softens with gratitude at the sight of her. When all the medical officers have retired for the night and silence and darkness have settled down upon those miles of prostrate sick, she may be observed alone, with a little lamp in her hand, making her solitary rounds.''

এদিকে তাঁর কাছে মহারানি ভিক্টোরিয়া ও যুবরাজ অ্যালবার্ট স্কুটারির কাহিনি শুনতে চাইলে বুদ্ধিমতী ফ্লোরেন্স সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে সেনা-সংস্কারের বিষয়টি তাঁদের বোঝাতে সচেষ্ট হলেন। এজন্য অবশ্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হল। সেনা হাসপাতাল ও ছাউনিগুলি ঘুরে ঘুরে তিনি রিপোর্ট তৈরি করলেন। স্কটল্যান্ডের বালমোরালে রানি ও যুবরাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। রানি তাঁর কম্যান্ডার ইন চিফকে লিখলেন, ''ফ্লোরেন্সকে সমর দপ্তরে পেলে আমাদের উপকার হত।'' বলা যায়, সেই ছিল সত্যিকারের শুরু । ফ্লোরেন্স বুঝতে পারলেন, কাজ করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মন্ত্রীদের নিজের কথা বোঝাতে হবে। মহিলা হওয়ায় রয়্যাল কমিশনের সদস্য বা রাজনীতিবিদ কোনওটাই তিনি হতে পারলেন না। শেষে তিনি কাজে লাগালেন সিডনি হার্বার্ট, ই চাডউইক, এইচ মার্টিনিয়ান প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী কিছু মানুষকে।

১৮৫৭ সালের মে মাসে চিকিৎসা পরিষেবার সমস্যা খতিয়ে দেখতে একটি কমিশন আলোচনায় বসল। ফ্লোরেন্স যুক্তি দিয়ে গাণিতিক তথ্যগুলিকে নিখুঁতভাবে সে-সভায় পেশ করলেন। এছাড়া ছ-মাস প্রচুর পরিশ্রম করে লিখলেন 'Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency and Hospital Administration of the British Army'। এইসময় ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ হওয়ায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই রিপোর্টে ভারতের ওপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Appendix বা পরিশিষ্ট জুড়ে দেন তিনি। অবিশ্বাস্যরকম সুস্পষ্ট, সুগভীর, সুচিন্তিত ছিল সেই রিপোর্ট। তাঁর প্রতিটি মন্তব্যের প্রমাণসহ সমর্থন ছিল সেখানে। ফ্লোরেন্স বোঝাতে চেয়েছিলেন, চাই প্রতিকার নয়—প্রতিরোধ। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করলেন, শান্তির সময়ে অল্পবয়সি সেনাদের মৃত্যুর হার সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ। কারণ সেনাদের অতি নিম্নমানের খাবার দেওয়া হত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু সুফল ফলল, কিছু ছাউনি পুনর্নির্মাণ করা হল। তিন বছরের মধ্যেই মৃত্যুর হার প্রায় অর্ধেক কমে গেল।

ফ্লোরেন্স সরকারকে ও অন্যান্যদের প্রতিবেদন দেওয়ার সময় পরিসংখ্যান দিতেন। ব্যবহার করতেন গ্রাফ, পাই চার্ট। এতে বিষয়টির গুরুত্ব এক নজরে বোঝা যেত। এই কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের পাই চার্টের উদ্ভাবন করেন—পোলার এরিয়া ডায়াগ্রাম। একে নাইটিঙ্গেল রোজ ডায়াগ্রাম বা সারকুলার হিসটোগ্রামও বলা হয়ে থাকে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি মরশুমে রোগীদের মৃত্যুর হার তুলে ধরে ফ্লোরেন্স নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এর সাহায্যে। তাই তাঁকে বলা হয় 'A true pioneer in the graphical representation of statistics'। পরিসংখ্যান নিয়ে তাঁর অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৫৯ সালে রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির প্রথম মহিলা সদস্য নির্বাচিত করা হয় তাঁকে। আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটিও

তাঁকে সাম্মানিক সদস্য করেন।

১৮৫৫-র নভেম্বরে লন্ডনে সিডনি ও লিজ হার্বার্টের প্রচেষ্টায় তেরোশো বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ফ্লোরেন্সের প্রদর্শিত পথে নার্সদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল নাইটিঙ্গেল ফান্ড। সাড়া মিলল আশাতীত। সৈনিকদের একদিনের বেতন দান করায় প্রায় ন-হাজার পাউন্ড চাঁদা উঠল। চার বছরে জমা অর্থের পরিমাণ দাঁড়াল পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউন্ড। এই ফান্ডের সাম্মানিক সচিব হলেন সিডনি হার্বার্ট, চেয়ারম্যান কেমব্রিজের ডিউক। ফ্লোরেন্সের স্বপ্নপূরণ ও ফান্ডের লক্ষ্যপূরণের জন্য ১৮৬০ সালের ৯ জুলাই লন্ডনের সেন্ট টমাস হসপিটালের সারা ওয়ার্ড্রোপারকে সুপারিনটেনডেন্ট করে চালু হল পেশাদার নার্স তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নাম দেওয়া হল 'নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস'। এটি বিশ্বের প্রথম সরকার-স্বীকৃত নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

এখানে নার্সদের সেই প্রশিক্ষণই দেওয়া হত যাতে তাঁরা অন্যদের শেখাতে পারেন, দায়িত্ব নিতে পারেন ও ফ্লোরেন্সের নির্ধারিত উচ্চমান বজায় রাখতে পারেন। ফ্লোরেন্স নার্সিং বিষয়ে একটি পুস্তিকাও লেখেন : 'নোটস অন নার্সিং'। এই প্রতিষ্ঠানে চারিত্রিক গুণাবলি ও প্রশংসাপত্র দেখে প্রার্থী বাছাই করে নেওয়া হত। তাঁদের শৃঙ্খলা খুব কঠোর ছিল। স্কুলটিকে আনন্দময় করে তোলার জন্য ফ্লোরেন্স তাঁদের ফুল, বই, ম্যাপ আর নানা ছবি পাঠাতেন। আগে কখনও নার্সরা পড়াশোনার এমন আনন্দময় পরিবেশ পাননি।

এই নাইটিঙ্গেল স্কুলের খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীব্যাপী। পনেরো বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীর সমস্ত হাসপাতালে নতুন শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য নাইটিঙ্গেলের নার্সদের প্রয়োজন হল। ১৮৮০ সাল থেকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, কানাডা, জার্মানি, সুইডেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বড় বড় হাসপাতালের নার্সরা এই শিক্ষাকেন্দ্রেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে লাগলেন।

ফ্লোরেন্সের উল্লেখযোগ্য অবদান হল বিজ্ঞানসম্মত নার্সিংয়ের প্রচলন করা, নার্সিংকে মহান পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং আধুনিক চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে নার্সিংকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি দেওয়া। তাঁরই চেষ্টায় নার্সদের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি হয় জনমানসে। তিনি সৃষ্টি করেন রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতার, সহমর্মিতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। হাসপাতাল পরিচালনার জন্য আদর্শবিধি রচনার পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন তিনি। এমনকী ১৮৮৭ সালে তিনি গড়ে তোলেন 'ব্রিটিশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন'—যা পেশাদার নার্সদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নটিকে সামনে রেখে তৈরি।

ড. এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল নামে এক মহিলা চিকিৎসক ছিলেন ফ্লোরেন্সের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ। তাঁরা একত্রে মহিলা চিকিৎসক তৈরির জন্য লন্ডনে 'উইমেনস মেডিকেল কলেজ' স্থাপন করেন (১৮৬৯)। এছাড়া তিনি জেলা নার্সদের প্রথম ট্রেনিং স্কুল শুরু করেন লিভারপুলে। ধাত্রীদের জন্য চালু হল কিংস কলেজ হাসপাতাল ট্রেনিং স্কুল ।

সমাজের কোন্ কাজটায় যে ফ্লোরেন্স হাত দেননি তা জানা নেই। যথার্থ দরদি মানুষ ছিলেন বলেই এতটা সম্ভব হতে পেরেছিল। ওয়ার্কহাউস সংস্কার তেমনই একটি কাজ। সেসময় ইংল্যান্ডের প্রতিটি নগর ও গ্রামে বিশেষ এক সারি বাড়ি থাকত, যেখানে নিঃসম্বল মানুষদের দিয়ে কাজ করানো হত, তাদের থাকা-খাওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হত যে তারা অত্যন্ত হীন এবং সমাজের বোঝা। অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থা ছিল সেটি। ১৮৬৪-র ডিসেম্বরে ওয়ার্কহাউসে চরম অবহেলায় একজনের মৃত্যু হলে ফ্লোরেন্স 'পুওর ল বোর্ডে'র বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

নার্সদের সঙ্গে ফ্লোরেন্স

আজ ফ্লোরেন্সের কথা লিখতে বসে প্রশ্ন জাগে কেন ভারতের ইতিহাসের পাতায় এই মহীয়সী নারীর স্থান হয়নি, যিনি জীবনের অমূল্য চল্লিশ বছর ব্যয় করেছিলেন (১৮৫৭-৯৭) ভারতের কৃষি-সেচ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য। লন্ডনে বসে শুধুমাত্র চিঠি, প্রতিবেদন ও বই লিখে তিনি একক সংগ্রাম করেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। বোম্বে, পুনা, মাদ্রাজ ও বাংলায় রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে তিনি ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রেরণা দেন সাধারণ মানুষকে। ১৮৭৬-এ বাংলায় কৃষকদের কথা বলার জন্য ফ্লোরেন্সের প্রেরণায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে এটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৮৫ সালে তিনি অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ও উইলিয়াম ওয়েডারবার্নকে সহায়তা করেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠায়। ভারতীয়দের স্বশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন ফ্লোরেন্স। 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' মুখপত্র 'ইন্ডিয়া' ব্রিটেনে প্রকাশিত হলে তিনি অর্থসাহায্য ও সমর্থন দুই-ই করেন।

১৮৬৫-তে ফ্লোরেন্সের নার্সদের পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে লিভারপুল ওয়ার্কহাউসে ঢুকতে দেওয়া হল। এই প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকর্মীরা দরিদ্র মানুষগুলির সেবা করল। ওয়ার্কহাউস সংস্কারের বিল পাস করিয়ে নিতে চাইলেন ফ্লোরেন্স। ১৮৬৭-তে মেট্রোপলিটন পুওর অ্যাক্ট পাশ হল।

সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফ্লোরেন্স বার্মিংহামশায়ারে নতুন কর্মসূচি নেন। ১৮৮২ সালে কাউন্টি কাউন্সিলের সাহায্যে এলাকার প্রতিটি বাড়িতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠান তিনি। তাঁরা আপনজনের মতো পরিবারের লোকেদের বোঝাতেন যে, নালানর্দমা পরিষ্কার রাখলে, সংক্রামক রোগজীবাণু নষ্ট করার জন্য নাশকদ্রব্য ব্যবহার করলে, বাড়িতে খোলা আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে কী সুফল পাওয়া যায়। এতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হল। ফলে সারা ইংল্যান্ড ক্রমশ একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবিধি-সচেতন দেশে পরিণত হল। ইংল্যান্ডকে দেখে ইউরোপের অন্য দেশগুলিও প্রভাবিত হল। এই পরিণতি ইংল্যান্ডকে পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল বিপুলভাবে।

শৈশবে ফ্লোরেন্স সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দাদাভাই নৌরজি, বি এম মালাবাড়ি, ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ, জি কে গোখেল প্রমুখ ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এছাড়া প্যারিচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। শুনলে আশ্চর্য লাগে, ১৮৬০-এর পর

থেকে সদ্যোনিযুক্ত ভারতের বড়লাটেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ নিয়ে তবেই ভারতে নিজ পদে যোগ দিতে আসতেন। ভারতের জন্য ফ্লোরেন্স চারটি পর্যায়ে কাজ করেন : সামরিক ও বেসামরিক স্বাস্থ্যবিধির রূপরেখা (১৮৫৭ থেকে শুরু), দুর্ভিক্ষ ও জলসেচ (১৮৭০-৭৮), জমির প্রজাস্বত্ব ও ভারতীয় কৃষক (১৮৭৯-৮৫), এবং গ্রামীণ স্যানিটেশন ও নারীশিক্ষা (১৮৮৬-৯৬)।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফ্লোরেন্সের কাছে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে প্রবেশের ছাড়পত্র এনে দিয়েছিল। এরপর রানির অনুমোদন পেয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যবিষয়ক রূপরেখা তৈরি করতে গিয়ে দুটি রয়্যাল কমিশনের (১৮৫৭ ও ১৮৬২) কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে কাজ করেন তিনি। কমিশনের সদস্য নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিবেদন তৈরি করা, রিপোর্ট পেশ—সবই তিনি নিজে করেন। এই রিপোর্টে 'observations' বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যোগ করে তিনি ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রতিবেদনটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচারও করেন।

ফ্লোরেন্স ১৮৬৩ সালে ভারতের জনগণের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে অনুসন্ধান এবং যথোপযুক্ত সুপারিশ ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য রয়্যাল কমিশন গঠন করেন। রীতি অনুযায়ী কমিশনের সদস্য কারা হবেন তা তিনি ঠিক করে দেন। সেইসময় ভারতের বড়লাট স্যার জন লরেন্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পেতেন তিনি। প্রায়শই হতে থাকা দুর্ভিক্ষ, দায়সারা সরকারি ব্যাখ্যা, ব্রিটিশ সরকারের কৃষকবিরোধী নীতিগুলি ফ্লোরেন্সকে ভাবিয়ে তোলে। উল্লেখ্য, সেইসময় নীলবিদ্রোহ ভয়ংকর আকার নেয়। দুর্ভিক্ষ কীভাবে রোধ করা যায়, কৃষকদের অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচানো যায়, তার পথ খুঁজতে থাকেন ফ্লোরেন্স। অন্যদিকে ব্রিটিশের দ্বিতীয় কমিশনের প্রতিবেদনের তীব্র বিরোধিতাও করেন। তার উত্তর দিতে ১৮৬৩-তে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত সোশ্যাল সায়েন্স কনফারেন্সের জন্য প্রবন্ধ লেখেন : 'How People May Live and Not Die in India'। ফলে ভারতীয়দের দুরবস্থার চিত্র ইংল্যান্ডের মানুষ সঠিকভাবে জানতে পারে।

পাশাপাশি ভারতের সেনানিবাসগুলিকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার জন্য ইন্ডিয়া অফিস ও ওয়ার অফিসের ওপর চাপ দিতে থাকেন তিনি। সেজন্য ১৮৬৪ সালে লেখেন 'Suggestions in regard to Sanitary works for Improving Indian Stations'। ভারতের হাসপাতালগুলির নার্সিং-এর উন্নতির জন্য ম্যাকনিলের সহায়তায় লেখেন 'Suggestions on a system of Nursing for Hospitals in India' (১৮৬৫)।

তাঁর পরিকল্পনাগুলি কতখানি কার্যকর হয়েছে তা জানার জন্য ফ্লোরেন্স শুধু বড়লাটের সঙ্গেই কথা বললেন না, পাশাপাশি সমাজসংস্কারক মেরি কার্পেন্টার, ডা. হ্যাথওয়ে, ডা. প্যাটিসন ওয়াকারের সঙ্গেও সমানতালে যোগাযোগ রেখে চললেন। সরকারি উদ্যোগের মধ্যে তিনি আন্তরিকতার অভাব লক্ষ করলেন ও জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাও দেখতে পেলেন না। তাই সরকারের জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরি কিছু করা যায় কি না সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৬৭ থেকে তিনি কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে বেসরকারিভাবে, ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ গড়ে তুলতে লাগলেন। পরের বছর ফ্লোরেন্স 'Memorandum on Measures Adopted for Sanitary Improvements in India upto the end of 1867' নামের স্মারকলিপিটি লেখেন। এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি সংস্কারের জন্য বড়লাটদের বারবার অনুরোধ করতে থাকেন।

১৮৬৯-এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। বেঙ্গল

সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় জাস্টিস জে বি ফিয়ার ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে সাম্মানিক সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ১৮৭০ সালের ২৫মে একটি চিঠি লিখে ফ্লোরেন্স তা সাদরে গ্রহণ করেন। চিঠির সঙ্গে কয়েকটি বই এবং একশো টাকা অ্যাসোসিয়েশনকে দান হিসেবে পাঠান। পরের মাসেই তিনি ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের সমস্যার সামাজিক দিকগুলি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরে সাত পাতার একটি চিঠি লেখেন। এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রেই ফ্লোরেন্স ভারতের আমজনতার স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে, কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাঁর ঐতিহাসিক সুপারিশগুলি সৃষ্টি করেন।

১৮৬৭ সালে কনস্ট্যান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল স্যানিটারি কংগ্রেসে এশিয়াটিক কলেরার জন্মভূমি হিসাবে ভারতকে চিহ্নিত করা হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন এই রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ বলেও দোষারোপ করা হয়। বিষয়টি জানার পর গ্রামের কৃষকদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে নানান প্রস্তাব দেন ফ্লোরেন্স। ব্রিটিশ প্রশাসন জাতপাতের অথবা অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে বিষয়টি বারবার এড়িয়ে গেলে, ফ্লোরেন্স বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্সের সাহায্য নিয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে জোর দিতে থাকেন। ওয়ার অফিস, ইন্ডিয়া অফিস ও সচিবদের অফিসের যাবতীয় সরকারি ও গোপন প্রতিবেদন, চিঠিপত্র দেখার সুযোগ ছিল ফ্লোরেন্সের। ফলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিহীন কৃষকের দুরবস্থা, কৃষিতে জলের অভাব, সেচের খালের অপ্রতুলতা তাঁর নজর এড়ায়নি। ১৮৭৩ সালে সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নরউইচে অনুষ্ঠিত সোশ্যাল সায়েন্স কনফারেন্সের জন্য তিনি লেখেন সাড়াজাগানো প্রবন্ধ : 'Life or Death in India, with an Appendix on Life or Death by Irrigation'।

ফ্লোরেন্স অনুভব করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা, কৃষিতে বিনিয়োগের অভাব, সেচের অপ্রতুলতা, জমিদারদের অত্যাচার, মহাজনদের শোষণ, বারবার দুর্ভিক্ষ—এই দরিদ্র কৃষকদের ক্রমেই ভূমিহারায় পরিণত করেছে। এই অবস্থাকে তিনি 'hundred headed hydra' বলেছেন। ফ্লোরেন্স পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন দুর্ভিক্ষের ফলে কর আদায়ের পরিমাণ কমেছে। অপ্রতুল হলেও দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ বাবদ সরকারি খরচ বেড়েছে। পঁচিশ বছরে ভারতে অনাহারে, রোগে এত লোক মারা গিয়েছে যা ইউরোপের একটা বড় দেশের লোকসংখ্যার থেকেও বেশি। ভারতের কৃষকদের জীবনে, ভারতের অর্থনীতিতে দুর্ভিক্ষের কুপ্রভাব নিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম গবেষণা করেন। এই তথ্যের সাহায্যে ভারতের কৃষকদের স্বার্থে ইংল্যান্ডে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন তিনি। ১৮৭৩-৭৪ সালে তিনি 'The Zamindar, the Sun and the Watering Pot as affecting Life or Death in India' নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি লেখেন।

ফ্লোরেন্স সেচের উন্নতির জন্য প্রচুর পরিমাণে খাল কাটার কথা বললেন যাতে অসময়ে ও অনাবৃষ্টিতে কৃষিকাজে ক্ষতি না হয়, অন্যদিকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সহজে ও সস্তায় যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়। কোন্ কোন্ নদীর কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে খাল কাটা হবে তারও একটা মানচিত্র তৈরি করেছিলেন ফ্লোরেন্স। তিনি আরও বলেন, ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার ও ক্ষেতে বর্গাচাষী নিয়োগের নিয়মকানুনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এর জন্য বর্গাদারদের কৃষিজমির ওপর কৃষিস্বত্বের ব্যবস্থা করতে হবে, সুদখোর মহাজন ও জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং তার জন্য কৃষিব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে। এই ব্যাঙ্কের জন্য তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের সঙ্গে কথাও বলেন।

১৮৭৪-এ Illustrated London News সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল 'Irrigation and Means of Transit in India'। এই লেখা প্রকাশিত হতেই ইংল্যান্ডে শোরগোল পড়ে গেল। রেলপথ গড়া বনাম খাল কাটা নিয়ে ইংল্যান্ডে বিতর্ক দানা বাঁধল। ব্রিটিশ সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে রেলে বেশি লাভ বলে বেশি বিনিয়োগ করে। অন্যদিকে সেচের জন্য খাল কাটার বিষয়ে ক্রমশ অর্থের জোগান কমতে থাকে। ফ্লোরেন্স তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে একটার পর একটা প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৭৮-এ লেখা 'The United Empire and the Indian peasant' ও ১৮৭৯-তে 'Irrigation and Water Transit in India' নামের দুটি প্রবন্ধ।

ফ্লোরেন্স রেলের বিরোধী ছিলেন না। কৃষিপ্রধান ভারতের কথা ভেবে তিনি বলেছিলেন, রেললাইন পাতা ও খাল কাটা দুটোই সমান গুরুত্ব পাক। তিনি তথ্য দিয়ে দেখান যে, ১৮৭১ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে সেচের জন্য সরকার খরচ করেছে মাত্র ৯২ লক্ষ পাউন্ড আর রেলপথের জন্য ২৩৯০ লক্ষ পাউন্ড। কৃষকদের তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন যাতে তারা অজ্ঞানতা ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি আরও চেয়েছিলেন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ব্যবহার করে গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে। এজন্য তিনি লেডি ডাফরিনকে মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার ব্যাপারে প্রকল্প গ্রহণের কথাও বলেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহ ভাল চোখে দেখেনি সরকার—বিশেষত ভারতসচিব লর্ড স্যালিসবারি। ফ্লোরেন্সের জীবনের শেষদিকে তাঁর সরকারি কাগজপত্র দেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। কিন্তু তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। মানবপ্রেমী, ধর্মপ্রাণ ফ্লোরেন্সের কাছে গোটা বিশ্বই ছিল গৃহ। নিপীড়িত, মূক মানুষের হয়ে তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন আজীবন। ১৯০৭ সালে সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁকে 'অর্ডার অফ মেরিট' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহিলা হিসেবে তিনিই প্রথম এই সম্মান পান।

১৮৬০-এর পর থেকে ফ্লোরেন্স শারীরিক কারণে আর বাইরে যেতেন না। ১৮৬১ সালে বন্ধু সিডনি হার্বার্টের মৃত্যু এবং ১৮৭৪-এ সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে তাঁর বাবার মৃত্যু—দুটি ঘটনাই তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করে। বাড়িতে বসেই তিনি সরকারি ও সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাদের অনৈতিক কাজের বিরোধিতা করতেন, লেখালেখি করতেন। ১৯০১ নাগাদ তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯০৬ থেকে শারীরিক অক্ষমতার জন্য সরকারি ও বেসরকারি কাগজপত্র নেওয়ার কাজও বন্ধ করে দেন। ১৯১০-এর মে মাসে নিউ ইয়র্কের কার্নেগি হল-এ অনুষ্ঠিত হল 'নাইটিঙ্গেল ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস'-এর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। ১৯১০-এর ১৩ আগস্ট আলোর দিশারি পাড়ি দিলেন চির-আলোর দেশে।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যে-আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন তা কখনও নেভেনি। যুগে যুগে তা ছড়াবে, ছড়াতেই থাকবে। সেই আদির কাছে নতজানু হয়েই নতুনকে এগিয়ে যেতে হয়। 'ফ্লোরেন্স'—এক দৃঢ়তা, একটি যুদ্ধ, একটি প্রেরণার নাম। সেই মহীয়সীকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

সহায়ক গ্রন্থ

১। প্যাম ব্রাউন, *ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল*, অনুবাদ : হাসির মল্লিক (ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড : কলকাতা, ১৯৯৮)

২। জলধর মল্লিক, *ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল* (গ্রন্থতীর্থ : কলকাতা, ২০১০)

৩। Jharna Gourlay, *Florence Nightingale and the Health of the Raj*